কালো জল

কালো জল

এম মামুন হোসেন

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

Kalo Jol by **M Mamun Hossain**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : February 2021
Price : 150.00
US $ 10
ISBN 978 984 95102 4 6

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪

http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

আমার সহধর্মিণী— **ইফাত আরা মিশু**
সংসার সুখের চাবি যার হাতে

'শালায়, পাইলসের জন্য চেয়ারে ঠিকমতো বসবার পারে না, আবার পোলা হইছে! পরপর তিন তিনটা মেয়ে, এখনো বংশরক্ষা হইল না। বন্ধুদের যেখানে একটা, না হয় বড়োজোর দুটি বাচ্চা। আর আমার স্ত্রীরে বছর বছর পোয়াতি কইরাও মনের আশ মিটল না।' ফেসবুকে 'কনগ্র্যাচুলেশন' শব্দটা লিখেই হাসান মনে মনে এইসব বিড়বিড় করছিল।

অন্তর জ্বালা! কারো পৌষমাস আর কারো সর্বনাশ। ফুটফুটে সদ্যোজাত শিশুর ছবি দিয়ে লিখেছে, 'আবার পুত্রসন্তানের জনক হলাম। রাজপুত্র ও তার মা ভালো আছে। সবাই দোয়া করবেন।' সবাই গদগদ হয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে জুয়েলকে।

হাসান আর জুয়েল স্কুল বন্ধু। দুদিন আগেও দেখা হয়েছে। হাসানের দোকানে এসেছিল জুয়েল। নানান কথা। এর মধ্যে বেশিরভাগ ছিল পাইলসসংক্রান্ত আলাপচারিতা। আগের চেয়ে এখন কম যন্ত্রণা দিচ্ছে পাইলস। হোমিও চিকিৎসা করাচ্ছে জুয়েল। ভারত থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত হোমিও চিকিৎসক। বিরাট নামডাক। মুরগিটোলা মোড় থেকে ধূপখোলা মাঠের দিকে যেতেই হোমিও ডাক্তারের চেম্বার। ক্যানসার পর্যন্ত তার কাছে কিচ্ছু না। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা এক্কেবারে জোচ্চুরি। সব টাকা খাওয়ার ধান্দা। ডাক্তারের কাছে গেলেই এই টেস্ট, ওই টেস্ট। নানান-তানান বাহানা করে একগাদা ওষুধ গছিয়ে দেয়। হাসান জুয়েলের হোমিও চিকিৎসার গুণকীর্তন শুনছিল। সেদিনও পুত্রপ্রাপ্তির বাসনা হাসানের মনে উঁকি দিয়েছিল। একবার ভেবেছিল পুত্র সন্তানের জন্য হোমিও কোনো ওষুধ আছে কি

না জিজ্ঞেসা করবে। একবার এটাও ভেবেছিল মুরগিটোলায় সেই ডাক্তারের কাছে যাবে। জুয়েলের কাছ থেকে ডাক্তারের আরও বৃত্তান্ত শোনার ইচ্ছাও হয়েছিল হাসানের। কিন্তু সেদিন আর এ নিয়ে কথা আগে বাড়েনি। হাসানের মনে পড়ে যায়, টিফিন প্রিরিয়ডে স্কুল পালিয়ে জুয়েলের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা। নবাবপুরের মানসী সিনেমা হল। 'এক টিকিটে দুই ছবি'। হাসান মনে করতে চেষ্টা করছে তারা তখন কোন ক্লাসে পড়ে। হ্যাঁ, ক্লাস টেনে পড়ে। প্রথম সাময়িক পরীক্ষা শেষ হয়েছিল তাদের। প্রথম ছবিটা ফাইটিং মারদাঙ্গা। পরেরটার কথা বেশ মনে আছে হাসানের। মনে পড়লে এখনো মাথা খারাপ হয়ে যায়। ধরা পড়লে আর রক্ষা ছিল না। বাড়ি থেকে বের করে দিত।

এই সময়টায় দোকানে টুকটাক বেচাকেনা হয়। ফেসবুকে এটা সেটা দেখেই সময় কাটে হাসানের। বাপ-দাদার বাড়ি, তার নিচেই দোকান 'মায়ের দোয়া স্টোর'। এটাকে এখন আর মুদিদোকান বলা যায় না। সবই বিক্রি করে। মেয়েদের সাজগোজের প্রসাধনী থেকে শুরু করে পেটিকোটের কাপড়ও পাওয়া যায় হাসানের দোকানে। বিক্রি কমে গেছে। হাসান ভাবে, ব্যাবসার নানা পদ্ধতি বের হয়েছে। ফেসবুকে লোকজন দোকান খুলে বসেছে। সেখানে বেচাকেনা হয়। ঠাটবাট দেখে বিক্রিবাট্টা ভালো বলেই মনে হয় তার। আগে দোকানে ইন্ডিয়া আর থাইল্যান্ডের জিনিসপত্র ভালো বিক্রি হতো। এখন তাতেও মন্দা। দেশসুদ্ধ সবাই কেনাকাটা করতে ইন্ডিয়া-থাইল্যান্ড চলে যায়। ব্যাগভরতি কেনাকাটা করে নিয়ে আসে। সেদিন হাসান পত্রিকায় দেখল মাত্র বারো হাজার টাকায় থাইল্যান্ডে আসা-যাওয়ার টিকিট।

তার দোকানের উলটো পাশেই স্কুল। বাচ্চাকে স্কুলে দিয়েই তাদের মায়েরা তার দোকানে আসে। দল বেঁধে আসে। কেনাকাটার চেয়ে বেশি আড্ডা দেয়। হাসান ভাবে, আড্ডা দেওয়ার ওসিলায় যদি কয়টা টাকা বিক্রি হয়, মন্দ কী? রবিবারই তো একজন বললেন, 'ভাবি এবার কিন্তু আমরা ঈদের কেনাকাটা করতে থাইল্যান্ড যাচ্ছি।'

আরেকজন বললেন, 'তাই নাকি ভাবি বলেন কী? আমরাও তো যাচ্ছি।' এই হলো অবস্থা!

বাপ-দাদার বাড়ির নিচে দোকান। ভাড়া লাগে না তাই কোনোরকমে টিকে আছে এমনটাই ভাবে হাসান। দোকানের নামে ফেসবুকে একটা লাইক পেজ খুলেছে। কয়েকদিন হলো নতুন একটা ছেলে রেখেছে দোকানে। আইডিয়াটা দোকানের নতুন ছেলেটার। চাঁদপুরের ছেলে রাজিব ম্যাট্রিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। দোকানে লোক রেখে শান্তি নেই। বেশিদিন টেকে না। এই ছেলেটা মনে হয় টিকে যাবে।

কাস্টমার এসে কার্ডে টাকা দিতে চায়। হাসান ভাবছে, একটা কার্ড মেশিন নেবে। তখন কাস্টমারদের বলবে 'দ্যান, টাকা কার্ডেই দ্যান'। কিছু কিনলে বিকাশে টাকা পেমেন্টের সিস্টেমও রেখেছে হাসান। সবকিছু বদলে যাচ্ছে। তার বাপ-দাদার এই মহল্লাও বদলে গেছে। নবদ্বীপ বসাক লেনের এই গলিতে হাতেগোনা কয়েকটা দালান ছিল। এখন এই গলিতে পুরোনো বাড়ি আর নেই। সব বড়ো বড়ো দালান।

হাসানের দোকানের ঠিক উলটো দিকেই স্কুল দুটি। একটি মেয়েদের আর অন্যটি ছেলেদের। খ্রিষ্টান মিশনারি স্কুল। ছেলেমেয়েকে ভর্তি করাতে মা-বাবারা হুমড়ি খেয়ে পড়েন। খ্রিষ্টানদের স্কুলগুলোর পুরো দেশজুড়েই কদর। এসব স্কুলে ভর্তি করাতে না পারলে লাইফটাই যেন বরবাদ হয়ে যাবে। মুসলমানদের এই দেশে মিশনারি স্কুল কলেজে না পড়তে পারলে অনেকের স্ট্যাটাস থাকে না। প্রতিবছর হাজার হাজার ভর্তি ফর্ম বিক্রি হয়। একটি ফর্ম কিনতে বাবা-মায়েরা সেই রাত থেকে রাস্তায় বসে থাকে। সেই সময় হাসানের দোকান খুব ভালো চলে। বেচাবিক্রি ভালো হয়। তখন তার মনটাও ফুরফুরে থাকে। হাসান শুনেছে, এবার অনলাইনে ফর্ম বিক্রি হবে। কোনো লাইন ধরতে হবে না। ইন্টারনেট দিয়েই ভর্তি ফর্ম কেনা যাবে।

ভর্তি মৌসুমে হাসানের আরেক কারণে কদর বেড়ে যায়। অনেক অভিভাবকই সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য হাসানের কাছে আসে। স্কুল কমিটির সভাপতির সাথে তার বেশ ভাব। যদিও টাকা ছাড়া কিচ্ছু হয় না। এরপরও হাসান খুশি এই পর্যন্ত যে কয়টি কেস দিয়েছে সবগুলোই হয়েছে। হাসান তখন নিজেকে বেশ পাওয়ারফুল মনে করে। বাচ্চাকে ভর্তি করানোর জন্য মোটা অঙ্কের ঘুষ দেয় বাবা-মায়েরা।

'হাসান ভাই, কেমন আছেন? ব্যাবসাবাণিজ্য ভালো নি ভাই?' তপন মিঞার বাক্যের আগে-পেছনে ভাই সম্বোধনে হাসান মনে মনে হাসে। আঁচ করতে পারে ভর্তি পার্টি। হাসানের দোকানের তিনটা বাড়ি পরেই তপন মিঞা ভাড়া থাকেন। ইসলামপুরে কাপড়ের দোকান আছে। বাড়ি বিক্রমপুর। ভাড়া থাকতে থাকতেই একদিন দেখা যাবে দুম করে বাড়ির মালিক হয়ে গেছেন। বিক্রমপুরের লোকগুলো এমন সুযোগেই থাকে। লক্ষ্মীবাজারের বেশিরভাগ বাড়িই এখন বিক্রমপুরের লোকেরা কিনে ফেলেছে। কেউ বাড়ি বিক্রির কথা স্বপ্নে ভাবলেও কেমনে যেন তারা টের পেয়ে যায়। এলাকার লোকজন ঘুণাক্ষরেও টের পায় না। সবকিছু হয়ে যাওয়ার পর জানে অমুক বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে। কে কিনেছে? হুঁ, নিশ্চিত কোনো বিক্রমপুইরা।

হাসান একদিন তপন মিঞাকে বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করতেই বলে উঠল, 'বিক্রমপুর'। হাসান বলেছিল, 'বিক্রমপুর বলতে তো কিছু নাই। মুন্সীগঞ্জ জেলার লোকজন আপনারা নিজেদের বিক্রিমপুর বইল্যা পরিচয় দেন।'

তপন মিঞা এই কথা শুনে একটু হেসে বলেছিল, 'ভাই কে কইছে বিক্রমপুর বইল্যা কিছু নাই। এক সময় পুরো বাংলার রাজধানী ছিল বিক্রমপুর। তার অংশ নিয়া জেলা হইছে মুন্সীগঞ্জ। তার আগে ঢাকা জেলায় ছিলাম আমরা। আমাদের সঙ্গে একটা খেলা খেলছে বুঝছেন। হিন্দুয়ানি নাম বাদ দিয়া মুসলমানি নাম রাখছে।'

একটু বিরতি নিয়ে নিশ্বাস টানলেন তপন মিঞা। তারপর

বললেন, 'বিক্রমপুর আছিল শ্রীনগর, দোহার, নবাবগঞ্জ, লৌহজং, সিরাজদীখান, টঙ্গিবাড়ি আর মুন্সীগঞ্জ উপজেলা নিয়া। ঢাকা জেলাতে দোহার আর নবাবগঞ্জ নিয়ে নিল। আর কুমিল্লার গজারিয়া আমাদের মধ্যে ঢুকাইয়া জেলার নাম দিলো মুন্সীগঞ্জ। সহস্রাব্দীর শ্রেষ্ঠ দুই বাঙালি অতীশ দীপঙ্কর, স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর জন্মস্থানে কী লেখা আছে, দেখেন-দেখেন বিক্রমপুর লেখা। শুধু হিন্দুয়ানি নাম দেইখা আমাদের ইতিহাসটাই নাই কইরা দিছে।'

এরপর থেকে টুকটাক বাজারসদাই হাসানের দোকান থেকেই করেন তপন মিঞা। এখন প্রায় প্রতিদিনই দোকানে আসেন। খোঁজখবর নেয়। তপন মিঞার ছেলেকে এবার স্কুলে ভর্তি করাবে। এই তদবির করতে হবে হাসানকে। আগে থেকে বুঝলেও চুপচাপ থাকে হাসান। তপন মিঞার কথার উত্তর না দিয়ে ঠোঁট প্রসারিত করে হাসে হাসান। এই হাসিই দুজনের ভালোমন্দের খোঁজখবর দিয়ে দেয়। তপন মিঞা হাসিকেই উত্তর মনে করে বলতে শুরু করেন, 'মাশল্লাহ! ভালোই মনে হচ্ছে দেখে।' একটি টুথপেস্টের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'ভাই টুথপেস্টটা কোন দেশের?'

হাসান বলল, 'থাইল্যান্ডের। খুব ভালো। আমি নিজেও ব্যবহার করছি। নতুন আসছে। সব জায়গায় পাবেন না।'

'আরে ভাই, আমি জানি। আপনি সব এ-ওয়ান মাল রাখেন। দাম কত?'

'দাম একটু বেশি, সাড়ে তিনশো।'

'হুঁ দামটা একটু বেশি। ভালো জিনিসের দামটা তো বেশি হবেই।'

'ডলারের দামও বেড়ে গেছে। ইম্পোটারদের পরতায় পড়ে না। এই টুথপেস্টটা আড়াইশো টাকায় বেচছি।'

'হাসান ভাই, ঠিক বলছেন, হঠাৎ করে ডলার যেন পাগলা ঘোড়া হয়ে গেছে। বাড়ছে তো বাড়ছেই।'

এসবই বাহানার কথাবার্তা। মনের কথাটা বলার জন্য হাসানের

সঙ্গে আলাপ জমাতে চাইছে তপন মিঞা। কিন্তু সংকোচের কারণে কথাটা কীভাবে বলবে— খুঁজে পাচ্ছে না। ছেলেকে এই স্কুলেই ভর্তি করাতে হবে তার মা বলে দিয়েছে। তপন মিঞা তার স্ত্রীকে বলেছেন, ছেলে যদি চান্স না পায় তাহলে কেমনে ভর্তি করাবেন? না, তার স্ত্রীর এক কথা টাকাপয়সা যা লাগে ছেলেকে এই স্কুলেই ভর্তি করাতে হবে। জীবনের শুরুতেই ঘুষ দিয়ে শুরু, সেই ছেলে বড়ো হয়ে কী মানুষ হবে? এসব কথাতেও তার স্ত্রীর মন গলেনি। এখন হাসানই তার ভরসা।

সকাল থেকেই মেজাজটা চড়ে আছে হাসানের। দোকানের ছেলেটাকে তাড়াতাড়ি আসতে বলেছিল। এখনো আসার কোনো খবর নেই। আজ ময়মনসিংহ যাবে হাসান। মামাতো শ্যালকের বিয়েতে গিয়েছে তার পরিবার। স্ত্রী আর কন্যাদের নিয়ে কালকে ঢাকায় ফিরে আসবে। সেখানে আজকের রাতটা থাকবে। মহাখালী থেকে ময়মনসিংহে বাসে যাবে। আর ফিরবে ট্রেনে। বউবাচ্চা নিয়ে বাসে আসা কষ্ট। সেখান থেকে বিকালের লাস্ট ট্রেন ধরবে ভেবে রেখেছে হাসান। ঘুম থেকে উঠেই রেডি হয়ে সোজা দোকানে চলে এসেছে। এখনো নাশতা করেনি। ভেবেছে মহাখালী গিয়ে কোনো একটা হোটেলে বসে নাশতা সারবে। কিন্তু বজ্জাত রাজিব সব হিসাবনিকাশ গোলমাল করে দিলো। লক্ষ্মীবাজার থেকে একটু হাঁটলেই বাস স্ট্যান্ড বাহাদুর শাহ পার্কের সামনে থেকেই মহাখালী যাওয়া যাবে। এখন কাগুজে নাম বাহাদুর শাহ পার্ক হলেও সেই ইংরেজদের দেওয়া ভিক্টোরিয়া পার্ক নামেই লোকজন চেনে।

ভিক্টোরিয়া পার্কের কোনাটায় একটি কার্ড ফোনের বুথ ছিল। সেটি অবশ্য টিঅ্যান্ডটি ফোনের যৌবনকালে। সেই সময়ে টিঅ্যান্ডটির ল্যান্ডফোনের কদর এখনকার ছেলেপুলেদের বোঝানো যাবে না। সবার হাতে হাতে এখন মোবাইল। একটি টিঅ্যান্ডটি ফোনের জন্য যে কত ঝক্কি পোহাতে হতো সেটা বোঝানো যাবে না। ল্যান্ডফোনের লাইন পাওয়া নিয়ে নানা কথা তখন প্রচলিত ছিল। সরকারি ফির চেয়ে শতগুণ বেশি ঘুষ দিতে হতো। লাইন সচল রাখতে তোয়াজ করতে হতো লাইনম্যানকে। কই গেল সেসব দিন। ভিক্টোরিয়া পার্কে ফোনবুথে কার্ড ঢুকিয়ে কথা বলা যেত। হাসান তখন ডিগ্রিতে পড়ে। টিঅ্যান্ডটি ফোনে এক মেয়ের সাথে কথা বলত। পার্কের ফোন বুথে তাই প্রতিদিনই যেত। সেখানে মেয়েটার সঙ্গে কথা বলত। ভালো

লাগত। অন্যরকম ভালো লাগা।

দোকানের বাইরে থেকেই রাজিব ডাক দিলো, 'হাসান ভাই'।

রাজিবের দিকে তাকাল। 'তোমাকে আজ তাড়াতাড়ি আসতে বললাম' কথা শেষ করল না হাসান।

'ভাই, একটা ঝামেলায় পড়ছিলাম।'

'এখন ঝামেলা শোনার টাইম নাই। যাও ক্যাশে গিয়া বসো' বলেই হাসান দৌড়ে দোকান থেকে বের হয়ে গেল।

মহাখালীতে ঠিকঠিক সময়ে পৌঁছল হাসান। রাস্তায় যানজট পায়নি। ভিআইপির চলাচলের জন্য রাস্তা ফাঁকা করেছিল। সেই সুযোগটাই নিয়েছে বাসচালক। এক মিনিট এদিক-সেদিক হলেই সিগন্যালের ফেরে আটকে পড়ে যেত। বাসচালকের চালাকি বেশ মনে ধরেছে হাসানের। একবার সিট থেকে উঠে বাসচালককে ধন্যবাদ দেওয়ার কথাও ভেবেছিল হাসান। দেওয়া হয়নি।

টিকিট নিয়ে বাসস্ট্যান্ডের পাশে থাকা রেস্টুরেন্টে নাশতা খেতে বসল হাসান। তন্দুর রুটি আর নেহারি আনতে বলল রেস্টুরেন্টের ছেলেটাকে। ভালো করে সালাদ বানিয়ে দিতে বলল। এখানে নেহারিটা ভালো বানায়। এর আগেও হাসান এই রেস্টুরেন্টে নাশতা করেছে। গরুর ঠ্যাং দিয়ে ঝোল ঝোল করে বানানো হয় নেহারি। আর খাসির ঠ্যাং দিয়ে বানালে পায়া বলে ঢাকার লোকজন। হাসান ধোঁয়া ছড়ানো নেহারিতে গরম গরম তন্দুর চুবিয়ে তৃপ্তি নিয়ে মুখে দিলো। হু, ভালো। তবে কলতাবাজারের বিসমিল্লাহ হোটেলের নেহারির তুলনাই হয় না। এক কথায় অসাধারণ! নেহারিতে নলি দেয়। নলিতে ফুঁ-রু-ত করে টান দিলেই নরম তুলতুলে গিলুতে মুখ ভরে যায়।

ক্যাশ কাউন্টারে নতুন একটি ছেলে বসা। ক্যাশ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। হাসান ভাবে, রেস্টুরেন্টে অনেকেই খাবার কিনতে এসে বলে এই ভালো করে দিয়ো। পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ দিছো। চরম বিরক্তি ভাব নিয়ে রেস্টুরেন্টের ছেলেটা অর্ডার নেয়। বিড়বিড় করবে শালা ফকিন্নি বাচ্চা। দশ টেকার জিনিস কিনতে আইসা হাজার টেকার ভাব নিচ্ছে। ক্যাশে বসা মালিকের ছেলে। সব সময় বসে না।

মাঝেমধ্যে বসে। এই প্রজাতির কাস্টমারকে সামলানোর অভিজ্ঞতাও কম। তাই চরম উৎসাহে কর্মচারীকে নির্দেশনা দেয়— ওই ভালো মতো দেখে দে। কাস্টমারকে বিদায় করে ছেলেটা বলে, 'ভাইজান আপনি কিচ্ছু বোঝেন না। এরা দশ টেকার জিনিস কিনতে আইসা হাজার টেকার ভাব নেয়। পেঁয়াজের কেজি কত জানেন?'

মালিকের ছেলে জানে না, পেঁয়াজের কেজি কত? ভাব নেয় সব জানে। ভাবভঙ্গি দেখে দ্বিগুণ উৎসাহে ছেলেটি বলে, 'এত পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ দিতে গেলে ব্যাবসা লাটে উঠব।'

মালিকের ছেলে ছ্যাঁৎ করে ওঠে। বলে, 'আমি দিতে কইলেই দিবি নি। তুই বোঝস না, কাস্টমারের সামনে এরকম কইতে হয়।' মালিকের ছেলে সব জানে এমন ভাব নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ওদিকে এসব দেখে হাসান মনে মনে হাসে।

হাসান ময়মনসিংহের বাসে চড়ে বসেছে। যানজটের ওপর নির্ভর করছে কখন পৌঁছবে। সকাল সকাল বেরুতে পারলে তাড়াতাড়ি যেতে পারত। এখন যানজট শুরু হয়ে গেছে। হাসান সিটে বসেই বুঝতে পারল পাশেই বমিপার্টি বসেছে। বিপদেই আছে। ঠিকঠাকমতো নিজেকে বাঁচিয়ে মামা শ্বশুরবাড়ি পৌঁছাতে পারলে হয়।

বাসে চড়লে কয়েক প্রজাতির যাত্রীর সঙ্গে দেখা মেলে। এর এক প্রজাতির মধ্যে আছে বাসে উঠেই কোনোরকমে সিটে বসতে পারলেই হলো। তারপর নাক ডেকে ঘুম। কখনো বামে। কিংবা কখনো ডানে কাত হয়ে পড়বেন। ডানে বা বামে হেলে পড়ার মধ্যে এক ধরনের ছন্দ আছে। মাঝেমধ্যে হেলে পাশের জনের ওপর পড়ে যাবেন। পাশের ভদ্রলোক তাকে হাত দিয়ে সরিয়ে দেবেন। এই সরানোয় তার কিঞ্চিৎ নিদ্রাভঙ্গ হবে। ঘুমের ঘোরে চোখ পিটপিট করে তাকাবেন। তারপর ঠোঁটের কোণ বেয়ে আসা লালা হাত দিয়ে মুছবেন। এরপর উলটো কাত হয়ে আবার সুখনিদ্রায় যাবেন। গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই মোটামুটি ঘুমিয়ে সতেজ। ঘুমের ঘোরে যেখানে নামার কথা সেটা পার হয়ে যাবে। এরপর বাসের হেলপারের সঙ্গে অ্যাকশন, এই ব্যাটা তোকে বলছি না আমি এখানে নামব। তুই জায়গামতো নামালি না কেন?

আরেক প্রজাতির যাত্রী হচ্ছে বমিপার্টি। এই বমিপার্টির লোকজন বাসে ওঠার আগেই বড়োসড়ো প্রস্তুতি নিয়ে ওঠেন। তাদের পাশ দিয়ে গেলেই বোঝা যায়। বমিপার্টির সদস্য। বাসে চড়েই পুরো উদ্যমে বমি করতে শুরু করেন। নন-স্টপ বমি করেন। বাসের সহকারী এই বমিপার্টির জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকে। তাদের জন্য পলিথিন রাখা হয়। বাসে চড়বার আগেই বমিপার্টির সদস্যরা লেবু কিংবা আচার নিয়ে ওঠেন। যেন-তেন লেবু নিলে হবে না। সুগন্ধি কাগজি লেবু হতে হবে। নানান রকমের আচার থাকবে। তেঁতুল আচার, আমের আচার, বরই আচার। বাসে আমড়া কিনবে। সেগুলো আয়েশ করে খাবে। আর বমি ঠ্যাকানোর চেষ্টা করবে। এত কিছুর পরও নন-স্টপ বমি করতে থাকবে। এই বমিপার্টির সদস্যরা যখন গন্তব্যে পৌঁছবে ততক্ষণে তার অবস্থা একেবারে কাহিল। নামার সময় অসহায়ের মতো অন্যান্য যাত্রীদের দিকে তাকাবেন। দেখে মনে হবে এই তার শেষবারের মতো বাস যাত্রা। মরে গেলেও ঘুণাক্ষরে বাসে উঠবেন না।

সুলতানা দশ দিন পর বাসায় এলো। বিয়ের পর এবারই লম্বা সময়ের জন্য ঢাকার বাইরে ছিল। মামাতো ভাইয়ের বিয়েতে বেশ বেড়িয়ে এলো। সুলতানা হাসানের স্ত্রী। বিয়ের পরপরই এক, দুই, তিন করে মেয়েদের বাবা-মা হয়ে গেল তারা। আট-দশটা দম্পতির মতোই তাদেরও দিনের পর রাত আসে। রাতের পর দিন আসে। এভাবেই চলছে। সুলতানার যখন বিয়ে হয় তখন বয়স ছিল ১৬ বছর। এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। রেজাল্ট তখনো হয়নি। লেখাপড়ায় ভালো। বিজ্ঞানের ছাত্রী। বান্ধবীদের কাছে মিস সুন্দরী। স্বপ্ন বোনার সময় দুম করে বিয়ে হয়ে গেল। রিয়াজ-শাবনুরের বাংলা সিনেমা দেখে মুগ্ধ ষোড়শী সুলতানা বউ হয়ে চলে এলো হাসানের সংসারে। তখন হাসানের বয়স ২৫ কি ২৬ বছর। তাদের বিয়ের বয়স সাত বছর হয়ে গেল। টেবিলে রাখা পত্রিকায় হঠাৎ চোখ পড়তেই হাসানের ভাবনা কেটে গেল।

পত্রিকার শিরোনামে চোখ আটকে গেল। 'প্রতিমাসে রেলে ক্ষতি ২০০ কোটি টাকা'। ট্রেনের টিকিট কিনতে গেলে পাওয়া যায় না। কিন্তু লস করে। সব লুটপাট। লুটপাটেই শেষ হয়ে গেল সব। প্রতিদিন দোকানে একটি দৈনিক পত্রিকা রাখে। লোকজন আসে পত্রিকা পড়ে। পত্রিকা পড়ার বাহানায় একটু-আধটু সদাই কেনে। মাঝেমধ্যে হাসান পুরো পত্রিকা একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। পত্রিকার খবরে হাসানের কোনো মাথাব্যথা নেই। কখনো ছিল না। আজও নেই। কিন্তু রেলের এই খবর হাসানকে অন্য একটি কারণে টানছে।

ময়মনসিংহ থেকে ঢাকায় ফিরেছিল ট্রেনে। সুলতানার মামাতো ভাই ওদেরকে ট্রেনে উঠিয়ে দিতে স্টেশনে এসেছিল। কিন্তু কাউন্টারে টিকিট নেই। বারবার অনুরোধ করেও তিনটি টিকিট পেল না হাসান।

টিকিট নেই তো নেই। কী করবে? ঢাকায় ফিরবে কীভাবে? সুলতানার ভাই বলল, 'চিন্তা কইরেন না, আমি টিকিটের ব্যবস্থা করছি।'

এ কথা শুনে হাসান তার দিকে অসহায়ের মতো তাকাল। ঠোঁট দুটি টেনে একটু হাসি দিয়ে চলে গেল সুলতানার মামাতো ভাই। কিছুক্ষণ পর আনসারকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো। আনসারকে দেখিয়ে বলল, 'উনি তিনটা সিট ম্যানেজ করে দেবেন। কোনো টেনশন নাই। হাসান ভাই, তারে দুশো টাকা দিয়ে দিলেই হবে।'

আনসারের লোকটি বলল, 'আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। ট্রেন থামলে আমি আপনাদের সিটে বসিয়ে দেবো। দ্যান ট্যাকা দ্যান।'

'ভাই সিটে বসলেই আপনার টাকা পেয়ে যাবেন।' হাসানের উত্তরে আনসার ভদ্রলোকের কিছুটা মনঃকষ্ট হলো বলেই মনে হয়। তবে হাসানের কথায়ও যুক্তি আছে— সিটে বসেই টাকা দেবে। যদি সিট দিতে না পারে তখন কী হবে। তখন টাকা দিয়ে পেছন পেছন দৌড়াতে হবে। ওই তো ট্রেন আসছে।

সুলতানা আর বাচ্চদের নিয়ে আনসারের দেখানো কামরাতে উঠল হাসান। সবগুলো সিটেই লোকজন বসে আছে। একটি সিটও ফাঁকা নেই। আনসার সিটে বসা লোকজনকে ধমকানো শুরু করল। 'এই আপনাদের টিকিট কই? ওঠেন। উনাদের বসতে দ্যান। এটা রিজার্ভ কামরা। টিকিট কই? টিকিট দ্যাখান। দ্যাখান কইছি।'

এসব ধমকিতে কিছু হলো না। কেউ টিকিটও দেখাল না। সিট ছেড়ে উঠেও দাঁড়াল না। সবাই যার যার মতো সিট ধরে বসে রইল। ওদিকে বউ পোলাপান নিয়ে হাসান হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাসানকে সিট দিতে পারল না।

'আমি পুলিশ নিয়া আসছি। সব ব্যাটারে ধইরা নেব।' আনসারের লোকটি শেষ হুমকি দিয়ে ট্রেন থেকে নেমে গেল। হাসান পড়ল মহাফাঁপরে। ট্রেন হুইস্‌ল দিচ্ছে। এক্ষুনি ছাড়বে। আনসারের লোকটি আর এলো না। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। কামরার সবাই টিকিট ছাড়া উঠলেও কেউ সিট ছাড়বে না। যারা বসে আছে তারাও বুঝে গেছে হাসানও টিকিট ছাড়া ট্রেনে উঠেছে। সিস্টেম করতে চেয়েছিল; হয়নি।

এর মধ্যে সুলতানা একটি কাজ করে বসল। সিটে বসা একজনকে বলল, 'একটু চেপে বসুন। এখানে আরও একজন বসা যাবে।' হাসান ভাবল তার বউয়ের সাহস আছে। লোকটি একবার সুলতানার দিকে তাকাল তারপর চেপে বসল। সুলতানা নিজে বসল। হাসান তখনো দাঁড়িয়ে আছে। এবার পাশের সিটে তাকিয়ে সুলতানা হাসানকে বলল, 'হাঁ করে তাকিয়ে আছো কেন? ওই সিটটাতে বসো। ভাই একটু সরে বসেন তো।' সুলতানার কথায় পাশের সিটও ফাঁকা হয়ে গেল। হাসান বসে পড়ল। হাসান মনে মনে ভাবল, সুলতানার বুকের পাটা আছে।